Copula: Jahangirnagar University Studies in Philosophy, Vol. XXXIV, June 2017

নীৎশের ক্ষমতার দর্শন

মোঃ আরিফুল ইসলাম*

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম**

[Abstract: Frirdrich Nietzsche was one of the major influential German philosophers, cultural critic and essayist in nienteenth century. His writings on language, truth, aesthetics, cultural theory, history, nihilism, power, morality, consciousness, and the meaning of existence have left a palpable impact on intellectual history and western philosophy. He is famous for uncompromising criticism of traditional European morality, relegion, and conventional philosophical theory, social and political ideals. One of the most importent aspects of his thought is the acceptence of 'will to power' as a fundamental principle of life, where he states that 'the will to power is the primitive form of affect, that all other affects are only developments of it'. By power Nietzsche meant 'worldy power and social success is in the form influencing people. This imlies that to a powerful one power means a satisfaction of gratitude without which he (powerful one) feels himself powerless.' The aim of this article is to delinate the salient features of the nature of 'will to power' and the state of 'will to power' in morality, theory of superman and democracy-nationalism.]

১.

বর্তমান সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-মনস্তাত্ত্বিক নানা প্রসঙ্গে ক্ষমতার ধারণাটি গুরুত্ব দাবী করে। এই ক্ষমতা নিয়ে যেসব চিন্তাবিদ তত্ত্ব দিয়েছেন এবং যাদের দর্শনে ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা গুরুত্বপূর্ণ তাদের মধ্যে নীৎশে[১] অন্যতম।

---

* **ড. মোঃ আরিফুল ইসলাম:** সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

** **মোঃ জাহাঙ্গীর আলম:** সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

1. ফ্রিডেরিখ নীৎশের (১৫ অক্টোবর ১৮৪৪- ২৫ আগষ্ট ১৯০০) তাঁর দেশ-কাল-সমাজের ঐতিহাসিক ফল এটি সত্যি। তবে এটিও অনস্বীকার্য যে তিনি তাঁর কালের ও সমাজের প্রতিষ্ঠিত মত, প্রথা, আদর্শের উপর আঘাত করেছেন ক্রমাগত। তাঁর পিতামহ এবং পিতা ছিলেন প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মযাজক। মাতা ছিলেন যাজক কন্যা। ফলে তিনি ধর্মীয়

নীৎশের মৃত্যুর পর তাঁর অপ্রকাশিত কিছু লেখার সঙ্কলন প্রকাশিত হয় *The Will to Power* নামে তাঁরই বোন এলিজাবেথ ফোরস্টার নীৎশের (১৮৪৬-১৯৩৫) সম্পাদনায়। এ বইটিকে অনেকে নীৎশের দর্শনের সারসংক্ষেপ বলে মনে করেন। রাধাকৃষ্ণাণ লিখেছেন, "The last work was evidently intended as a resume of his whole philosophical position, but was left in an unfinished state."[২] এ গ্রন্থে নীৎশে 'ক্ষমতার ইচ্ছা' কে জীবনের মৌলনীতি হিসেবে তুলে ধরেছেন। ধর্ম ও নৈতিকতা, রাজনীতি সর্বক্ষেত্রে নীৎশের চিন্তার তাত্ত্বিক ভিত্তি হলো এই 'ক্ষমতার ইচ্ছা'।

২.ক্ষমতার ইচ্ছা

'ক্ষমতার প্রতি ইচ্ছা' (Will to Power) হলো নীৎশের দর্শনের অন্যতম মূল বিষয়। এক্ষেত্রে তিনি তাঁর পূর্বসূরী শোপেনহাওয়ার কর্তৃক প্রভাবিত হয়েও তাঁর থেকে নিজেকে পৃথক করেছেন। শোপেনহাওয়ার তাঁর ভাববাদী দর্শনে 'ইচ্ছা'কে (Will) সত্তা হিসেবে তুলে ধরেছেন এবং এ সত্তাকে জানা যায় বলে স্বীকার করেছেন। তিনি ইমানুয়েল কান্টের অবভাস ও সত্তার মধ্যেকার পার্থক্যকে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু কাণ্ট যেভাবে সত্তাকে অবভাসের কারণ হিসেবে উল্লেখ করে সত্তাকে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বলেছেন শোপেনহাওয়ার তা স্বীকার করেননি।[৩] তাঁর মতে সত্তা অজ্ঞেয় নয়, অবভাসের কারণও নয়, বরং এ দুটি একই মুদ্রার দুই

পরিবেশেই বড় হয়ে উঠেন। তবে ধর্মীয় পরিবেশে বড় হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের সাথে সাথে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে আমুল পরিবর্তন ঘটে এবং তিনি পরিবারের সব প্রচলিত প্রথা ও সংস্কৃতি বর্জন করেন। এক্ষেত্রে নীৎশের মানসভূমি গঠনে প্রভাববিস্তারকারীদের অন্যতম হলেন প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক হেরাক্লিটাস, আধুনিক কালের দার্শনিক আর্থার শোপেনহাওয়ার (১৭৮৮-১৮৬০) ও সুরকার ভাগনার নীৎশে প্রথমে জার্মানীর বন বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং পরে লাইপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন, সাহিত্য ও ধ্রুপদী ভাষাতত্ত্বের ছাত্র ছিলেন। এ সময়ই তাঁর চিন্তার উৎকর্ষ ও মৌলিকতা এতটাই স্পষ্ট হয়ে উঠে যে ডিগ্রি অর্জনের পূর্বেই মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে তিনি বাজেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ধ্রুপদী ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন (১৮৬৯)। তাঁর রচনাকর্মগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো *The Birth of Tragedy out of Spirit of Music* (১৮৭২), *Human, All Too Human* (1878), *Thus Spake Zarathustra* (১৮৮৩-১৮৮৫), *Beyond Good and Evil* (1886), *On the Genealogy of Morality* (১৮৮৭)।

2. S. Radhakrishnan, *History of Philosophy Eastern and Western*, Vol. 2, (London: George Allen & Unwin Ltd., 1967), P. 293.
3. Arati Barua, *The Philosophy of Arthur Schopenhauer* (New Delhi: Intellectual Publishing House, 1990), pp.87-89.

পিঠ। সত্তাকে আমরা যেভাবে প্রত্যক্ষ করি সেটাই অবভাস। কাণ্ট সত্তার স্বরূপ সম্পর্কে কিছু বলেননি কারণ সেটি তাঁর মতে অজ্ঞাত। আর শোপেনহাওয়ারের মতে, ইচ্ছাই (Will) হল সত্তা।[৪] ইচ্ছা সমস্ত অবভাসের পেছনে একমাত্র সত্য। এই ইচ্ছাসত্তা এবং অবভাস দুই নিয়েই শোপেনহাওয়ারের দ্বৈতবাদ। এ ইচ্ছাই তাঁর মতে বিশ্ব জগতের কারণ ও চালিকাশক্তি। তিনি উল্লেখ করেনে, "Will is the think-in-itself, the inner content, the essence of the world. Life, the visible world, the phenomenon is only the mirror of the will."[৫] তবে এ ইচ্ছা কেবল বাঁচার ইচ্ছা বা টিকে থাকার ইচ্ছে (Will to Live)। এ ইচ্ছা অন্ধ ও অযৌক্তিক, নির্দিষ্ট কোনো গন্তব্য তার নেই। যেহেতু বাঁচার ইচ্ছাই সত্তা এবং এর থেকে কোনোভাবেই মুক্তি নেই তাই সোপেনহাওয়ার জগতকে দুঃখময় বলেছেন। এজন্য তিনি একজন দুঃখবাদী (Pessimistic) হিসেবে পরিচিত।

শোপেনহাওয়ার যেখানে দুঃখবাদী নীৎশে সেখানে ক্ষমতাতাড়িত। এটা ঠিক যে নীৎশে শোপেনহাওয়ারের 'ইচ্ছা'কে জীবনের মৌলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তবে শোপেনহাওয়ারের থেকে নীৎশের ভিন্নতা হলো নীৎশে জীবনের মৌলনীতি হিসেবে 'বেঁচে থাকার ইচ্ছা'র পরিবর্তে 'ক্ষমতা লাভের ইচ্ছা'কে (Will to Power) গ্রহণ করেন। শোপেনহাওয়ার ইচ্ছাকে অপরিবর্তনীয় সত্তা হিসেবে গ্রহণ করেছেন কিন্তু নীৎশে এমন কোনো অপরিবর্তনীয় সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করেননি। এক্ষেত্রে তিনি প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক হেরাক্লিটাসের দ্বারা প্রভাবিত বলে মনে হয়। কারণ নীৎশে হেরাক্লিটাসের সদা পরিবর্তনশীল বিশ্বের তত্ত্বটি মেনে নিয়ে একই রকম বলেছেন যে বস্তুনিষ্ঠ স্থিরতা একটা ভান এবং সত্তা একটি ভ্রম। পরম বস্তু বলে আসলে কিছু নেই। প্রত্যেকটি বস্তু হয়ে উঠতে চায়, তার অনেক অনেক সম্ভাবনাকে বাস্তবায়ন করতে চায়। শুন্য থেকে পূর্ণ হয়ে উঠতে ও নিজেকে অতিক্রম করতে বস্তু সব সময়ই সক্রিয়। আর এসব কিছুর পেছনে কাজ করছে একটি শক্তি। এ শক্তিই হলো নীৎশের ক্ষমতার ইচ্ছা। এখানে কোনো রাজনৈতিক বা কোনো অর্থনৈতিক ক্ষমতার কথা নীৎশে বলছেন না, বরং তিনি সম্ভাবনাকে বাস্তবায়ন করার ক্ষমতার কথা বলছেন। নীৎশের মতানুসারে, বেঁচে থাকার ইচ্ছা আসলে ক্ষমতা প্রদর্শন ও প্রয়োগের ইচ্ছা। বেঁচে থাকার অর্থই হল

4. in: W.K. Wright, *History of Modern Phelosophy* (New York: The Macmillan Company, 1962), p.361.
5. Arthur Schopenhouer, *The world as will and Idea*, Vol. 1, p. 354, in:Arati Barua, *The Philosophy of Arthur SchopenhauerI*, p.73.

শক্তিশালী হওয়ার, টিকে থাকার, নিজকে প্রকাশ করার এবং প্রয়োজন অনুসারে অগ্রসর হওয়ার ক্ষমতা। এককথায়, বেঁচে থাকার ইচ্ছামাত্র ক্ষমতা অর্জনের ইচ্ছা। জীবনমাত্রই অতিরিক্ত ক্ষমতা অর্জনের প্রচেষ্টা। নীৎশের মতে, মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পকলা, সংস্কৃতি প্রভৃতি সবই চর্চা করে ক্ষমতা অর্জনের লক্ষে। অর্থাৎ সমাজের সমস্ত পরিবর্তনের মূলে রয়েছে ক্ষমতার প্রতি আকাঙ্খা। নীৎশের ভাষায়, "[My theory would be:-] that the will to power is the primitive form of affect, that all other affects are only developments of it;"[৬] নীৎশে ডারউইন ও হার্বাট স্পেন্সার দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন কিন্তু সামাজিক বিবর্তনের বিষয়ে নীৎশের মতবাদ তাদের থেকে ভিন্ন। এমনকি তিনি যন্ত্রবাদ ও জড়বাদ পুরোপুরি পরিত্যাগ করে ক্ষমতার আকাঙ্খাই যে মূল বিষয় সে বিষয়ে দৃঢ় মত পোষণ করেন। এ প্রসঙ্গে রাইট লিখেছেন, "Nietzsche rejects machanism and materialism entirely. He believes that the fundamental impulsive force in nature is the will for power"[৭]

একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, *ট্র্যাজেডির জন্ম* ও *মেডিটেশন* এর মতো প্রথম দিকের রচনাগুলোতে নীৎশে ক্ষমতাকে ঘৃণা করেছেন। *ট্র্যাজেডির জন্ম* তে তিনি বলেছেন, 'ক্ষমতা সব সময়ই অশুভ'।[৮]কারণ ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষায় এবং ক্ষমতার পেছনে ছুটতে গিয়ে মানুষ নিজের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে। *মেডিটেশনে* নীৎশে উল্লেখ করছেন তাঁর গুরু ভাগনার সাফল্য ও ক্ষমতার স্বাদ পেয়েই অধোপতিত হয়েছিলেন এবং চার্চের বশ্যতা মেনে নিয়েছিলেন।[৯] তবে *হিইম্যান, অল টু হিউম্যান* গ্রন্থটি থেকে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে থাকে।সমাজে মানুষের প্রতিটি আচরণের পেছনে ক্ষমতা কীভাবে কাজ করে তার একটি মনস্তাত্ত্বিক কাঠামো দেবার চেষ্টা করেছেন তিনি এ গ্রন্থে। তাঁর মতে, মানুষ যে কৃতজ্ঞতা পোষণ করে, করুণা দেখায় কিংবা আত্মত্যাগ করে সবই ক্ষমতা অর্জনের জন্য। যেমন কৃতজ্ঞতা ক্ষমতার ইচ্ছার একটি প্রকাশ। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ যেনো উপকারীর প্রতি একটু মৃদু

---

6. F. W. Nietzsche, *The Will to Power*, Trans. by Walter Kaufmann and R.J. Hollingdale, Edited by Walter Kaufmann (New York: Vintage Books, 1968), p.366.
7. W.K. Wright, *History of Modern Phelosophy,* p.393.
8. in: Walter Kaufmann, *Nietzsche* (New York: Meridian Books, 1960 5th Printing), p. 154.
9. in: Kaufmann, *Nietzsche,* p. 154.

প্রতিশোধ।[১০]দৃষ্টান্ত দিয়ে নীৎশের এমতটি বোঝানো যেতে পারে। সাধরণত সব সমাজে কৃতজ্ঞতা পোষণ করাকে সদগুণ হিসেবে দেখা হয়। ধরা যাক; ক খ এর উপকার করলো। খ এর প্রয়োজন ছিল বলেই সে ক এর নিকট থেকে সাহায্য গ্রহণ করলো। কিন্তু সাহায্য নিয়েই খ নিজের নিকট এবং একই সাথে ক এর নিকট ছোটো হয়ে গেলো। এ অবস্থায় খ নিজের মর্যাদা বাড়ানোর জন্য, ক এর সাথে নিজের মর্যাদাগত দূরত্ব কমানোর জন্য, নিজের হীনমন্যতাবোধ দূর করার জন্য অর্থাৎ কিছুটা ক্ষমতা অর্জনের জন্য ক এর প্রতি কৃতজ্ঞতা পোষণ করে, ধন্যবাদ দেয়। বিষয়টা এমন যে উপকারটা খ এর প্রাপ্য ছিল। খ নিজের অবস্থানটি ঘুরিয়ে দিতে চায়, বলতে চায় আমিও ক্ষমতবান, তুমি আমার সেবা করলে। 'ধন্যবাদ' তোমার জন্য পুরস্কার, কারণ ধন্যবাদ সব সময় উপর থেকে জানানো হয়। এ অর্থে এখানে ধন্যবাদ প্রদান বা কৃতজ্ঞতা পোষণ মৃদু প্রতিশোধ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এখানে গুরুত্বপূর্ণ হলো নীৎশে মানুষের নৈতিক মূল্যবোধকে ক্ষমতার ইচ্ছা দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। অনুরূপভাবে, করুণা, কৃচ্ছতাসাধন, বিনয়, আত্মত্যাগ এমনকি ক্ষমতা ত্যাগকে ক্ষমতা লাভের ইচ্ছা হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়।

নীৎশে ক্ষমতা অর্জনের ইচ্ছাকে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করায় যারা শক্তিমান তাদের প্রশংসা করেছেন এবং এমনকি যুদ্ধকে মন্দ বিষয় হিসেবে নয় বরং গ্রহণীয় বলে মনে করেছেন। কারণ তাঁর মতে, যুদ্ধের মধ্য দিয়েহৈ উন্নততর জগতের সৃষ্টি হয় এবং আত্মোৎসর্গ, সাহস, মহত্ত্ব ইত্যাদি সদ্‌গুলো বিকশিত হয়। নীৎশের এ মনোভাব উনিশ শতকে ইউরোপের প্রচলিত সমাজ ভাবনার বিরোধী। উনিশ শতকে ইউরোপে মধ্যবিত্ত মানসিকতার প্রাধান্যের ফলে মানুষের যে ছবি ফুটে উঠেছিল, তার মূল কথা হলো প্রকৃতিগতভাবেই মানুষ পরিশ্রমী, প্রয়োজনে লাগে এবং সকলের সাথে মিলে মিশে থাকতে চায়। এর রকম গড়পড়তা সাধারণ মানুষ নয় বরং নীৎশের আদর্শ হলো দুঃসাহসী ও শক্তিমান মানুষ যিনি যোদ্ধার জীবন পছন্দ করবেন।

তবে নীৎশে ক্ষমতার অশুভ দিকটি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাঁর মূল বক্তব্য হলো ক্ষমতার অন্তর্নিহিত মূল্যটি অশুভ নয়। ক্ষমতার ব্যবহারিক মূল্য ব্যবহারকারিই নির্ধারণ করে এটা সত্যি। এটাও সত্য যে, শাসক মাত্রই ক্ষমতাধর। তাই বলে ক্ষমতাবান হলেই অত্যচারী হওয়া আবশ্যিক নয়। নীৎশে মনে করেন অন্যকে আঘাত দেওয়াটা ক্ষমতার পরিচয় নয়। প্রকৃত ক্ষমতাবান

10. in: Kaufmann, *Nietzsche,* p. 157.

সৃজনশীলতার মাধ্যমে তাঁর ক্ষমতার পরিচয় দেয়। নীৎশের মতে যারা দূর্বল তারাই নিরন্তর আঘাত দিয়ে আনন্দ উপভোগ করে। নীৎশে ক্ষমতাধর মানুষের ক্রম করেছেন এবং যেসব বর্বর অন্যকে আঘাত করে তিনি তাদেরকে সবচেয়ে নিম্ন শ্রেণীর বলে উল্লেখ করেছেন। আর সর্বোচ্চ স্তরে রেখেছেন সেসব ক্ষমতাধরকে যাঁরা অন্যকে নয় বরং নিজকে কষ্ট দেয়। তাঁর মতে ক্ষমতার সর্বোচ্চ প্রকাশ আত্মপীড়নে। রাজনৈতিক ক্ষমতার যথেচ্চারকে নীৎশে বর্বরতার পরিচায়ক বলে মনে করেন। 'রাইখ' এর ক্ষমতা নীৎশের নিকট কাম্য নয়, বিসমার্কও নীৎশের বিচারে নিচের দিকে থাকবেন। কিন্তু যিশু থাকবেন একেবারে উপরের দিকে। নীৎশের এই ক্ষমতার দর্শনের প্রভাব দেখা যায় নৈতিকতা সম্পর্কে তাঁর চিন্তার ভিত্তিমূলে।

৩. নৈতিকতা প্রসঙ্গে

নীৎশের মতে, যে কাজ পার্থিবজগতে মানুষকে ক্ষমতাবান করবে সেটাই করা উচিৎ। তাঁর লক্ষ্য সামষ্টিক মানুষ নয়, কেবল ব্যক্তি মানুষের পার্থিব জীবন। এ কারণে তিনি ইমানুয়েল কান্টের 'কৃচ্ছ্বতা তত্ত্ব' (Rigorism), জন স্টুয়ার্ট মিল ও জেরোমী বেনথামের 'সুখবাদ' (Hedonism), কিংবা খ্রিষ্ট ধর্মের নৈতিকতার ধারণাকে তীব্রভাবে সমালোচনা করেছেন। কান্টের 'কৃচ্ছ্বতা সাধনতত্ত্ব'র মূল বক্তব্য হলো 'কর্তব্যের জন্য কর্তব্য' (Duty for Duty Sake), কর্তব্য থেকে কোনো মুক্তি নেই। কান্টের কর্তব্যের এই নৈতিকতাকে নীৎশে অস্বীকার করেছেন। এমনকি নীৎশে মিল ও বেনথামের সুখবাদী মতবাদ যেখানে 'সর্বাধিক লোকের জন্য সর্বাধিক সুখ' কামনা করা হয় সেটিকেও অস্বীকার করেছেন। এক্ষেত্রে নীৎশের যুক্তি হলো মিল-বেনথামের সুখবাদী মতবাদে ব্যক্তি মানুষের সুখকে বড় করে দেখা হয়নি। একজনের জন্য যা শুভ অন্যের জন্য তা-ই শুভ এটাই সুখবাদীদের মূল কথা। খ্রিস্টধর্মের অশুভ প্রভাবে সুখবাদীদের নীতির উদ্ভব বলে নীৎশে মনে করতেন। নীৎশের আরো যুক্তি হলো অনেক সময়ই মানুষ সুখকে বিসর্জন দেয় ক্ষমতা লাভের জন্য। আসলে মানুষ যা অর্জন করতে চায় তা সুখ নয় ক্ষমতা।[১১] নীৎশের মত তুলে ধরতে গিয়ে ফ্রাঙ্ক থিলি মন্তব্য করেছেন, "What men desire ultimately is not pleasure – if this term is taken to imply the absence of pain. Men willingly Sacrifice pleasures and

11. Kaufmann, *Nietzsche*, p. 223.

incur suffering for the sake of greater power...'"[১২] নীৎশে আরো উল্লেখ করেন মানুষের ক্ষমতা অর্জনের প্রচেষ্টার মধ্যে শুধু সুখ নয় দুঃখও জড়িত থাকে। তাই দুঃখহীন বিশুদ্ধ সুখী জীবন নয় বরং ক্ষমতার সৃষ্টিশীল প্রয়োগের মধ্যেই প্রকৃত সুখ নিহিত বলে নীৎশে মনে করেন। প্রশ্ন হলো এ জীবন কীভাবে সম্ভব? নীৎশের বিশ্বাস প্রবৃত্তিকে দমন করে ক্ষমতাকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারলে যেকোনো মানুষ সাধারণ অবস্থা থেকে অতি উচ্চে উঠে অতিমানবের (Superman) পর্যায়ে পৌঁছুতে সক্ষম হবে।

নীৎশে নৈতিকতার আপেক্ষিক গুরুত্ব বিচার করতে চেয়েছেন। তাঁর নিকট ভাল-মন্দ বিষয়টি আপেক্ষিক, এর কোনো চূড়ান্ত অর্থ নেই। *জরথুস্ত্র* গ্রন্থে তিনি বললেন "'ভালো' কী? যা শক্তির অনুভূতিকে বাড়ায়, শক্তির ইচ্ছাকে বাড়ায়- সেই শক্তি যা মানুষের নিজস্ব। 'মন্দ' কী? দুর্বলতা থেকে যা জন্মায়, তাই। সুখ কী? শক্তি যে বাড়ছে তার অনুভূতি, সব বাধা দূর হয়ে যাচ্ছে, এ অনুভব...।"[১৩] নীৎশের মতে মানুষ সুখ কামনা করে, কারণ সে বর্ধিত শক্তি বা ক্ষমতার অনুভব পেতে চায়। সুখের সবচেয়ে বড় উৎস হলো শক্তি বা ক্ষমতা। এই ক্ষমতাই ভাল-মন্দ বিচারের মাপকাঠি। নীৎশের ভাল-মন্দের ধারণাটি ঠিক গণতান্ত্রিক আদর্শ বলতে যা বোঝায় তা নয়। এমনকি উপযোগবাদী আদর্শের আলোকে সংখ্যাগরিষ্ঠের সুখের প্রতি অতিমানব অন্তরায় না হলেও সর্বাধিক লোকের সুখ অর্জন তাঁর মূল লক্ষ্য নয়। অতিমানবের লক্ষ্য হলো সৃষ্টিশীলতা।

নীৎশে তাঁর *জেনোলজি অব মর‍্যালস্* গ্রন্থে সবধরনের নৈতিক তত্ত্বের মধ্যে একটি সূত্র খোঁজার চেষ্টা করেছেন। এবং এসব নীতিতত্ত্বের মধ্যে তিনি দুটি ধারা দেখতে পেয়েছেন। একটি হলো শাসক নৈতিকতা (Master Morality) ও অন্যটি হলো দাস নৈতিকতা (Slave Morality)। তাঁর মতে দুই ধরনের নৈতিকতাতেই ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটেছে, তবে আলাদা ভাবে। শাসক নৈতিকতায় ক্ষমতাকে সরাসরি স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, আর দাস নৈতিকতায় ক্ষমতাকে অস্বীকার করা হয়েছে। নীৎশে মনে করেন যাদের অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও প্রাণশক্তি রয়েছে তারা শাসক নৈতিকতার অধিকারী। অন্যদিকে, যারা দূর্বল, সবসময় দূঃখভারাক্রান্ত, ভীতু ও পরাশ্রিত তারা দাস নৈতিকতার অধিকারী। তিনি

---

12. F. Thilly, *A History of Philosophy* (New York: Hopt, Rinehart and Winston, 1957), p. 504.
13. গৃহীত: শ্রাবন্তী ভৌমিক, *বেঁচে থাকার দর্শন* (কলকাতা: এবং মুশায়েরা,২০০৮), পৃ. ৫৯।

মনে করেন দূর্বলেরাই সব সময় সকলের সমান অধিকার, সমতা প্রভৃতির কথা বলে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দূর্বলরাই নৈতিকতার দোহাই দিয়ে ক্ষমতাবানকে টেনে নামাতে চায়। নীৎশে খ্রিস্টীয় নৈতিকতাকে দাসসুলভ নৈতিকতা বলে অভিযুক্ত করেছেন। কারণ হিসেবে তিনি খ্রিস্টধর্মের প্রেম, বিনয়, করুণা, ভদ্রতা, দয়া প্রভৃতি শিক্ষার কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, এ ধরনের নৈতিকতা সাহসী মানুষের জন্য নয়, দূর্বলদের জন্য। খ্রিস্ট ধর্ম ও নৈতিকতার বিরুদ্ধে নীৎশের অভিযোগ হলো এতে ব্যক্তি মানুষের যথাযথ মূল্যায়ন করা হয় না। খ্রিষ্ট ধর্মের প্রেমের বাণীকে তিনি কঠোর সমালোচনা করেন। খ্রিষ্ট নৈতিকতায় প্রতিবেশীকে ভালবাসার শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু নীৎশে মনে করেন ভালবাসা বা প্রেম ভয় থেকে সৃষ্ট। তাঁর মতে, প্রতিবেশীকে আমরা ভয় পাই বলেই বলতে শুরু করি 'আমরা প্রতিবেশীকে ভালোবাসি', যদি শক্তি থাকতো তবে প্রতিবেশীকে ঘৃণা করতাম। আর এটাই সত্য। মানুষ যে কখনো নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসতে পারে নীৎশের নিকট সেটা সম্ভব বলে মনে হয়নি। নীৎশে প্রতিবেশীকে ভালোবাসার কথা বলেননি। তিনি বলেন, "দূরকে ভালোবাসো; প্রতিবেশী নয়, আমি বলি বন্ধু খোঁজো।"[১৪] তাঁর আদর্শ ছিল 'মহৎ মানুষ'- যার মধ্যে কোনো সহানুভূতি নেই, যিনি হবেন চালাক, নির্মম ও নিষ্ঠুর। যাঁর একমাত্র আকাঙ্ক্ষা থাকবে কেবল নিজ ক্ষমতা বৃদ্ধি।

খ্রিষ্ট নৈতিকতা প্রসঙ্গে নীৎশের অবস্থান আরো পরিস্কার হয় যখন তিনি ঈশ্বরের মৃত্যু ঘোষণা করেন। তিনি বলেছিলেন ঈশ্বর মারা গেছে।[১৫] প্রশ্ন হলো কীভাবে ঈশ্বর মারা গেলেন? নীৎশের মত হলো মানুষের জন্য করুণা করতে করতেই তাঁর মৃত্যু হলো। এজন্য তিনি এই করুণা থেকে সতর্ক হতে বলেছেন। তাঁর মতে, করুণা একটা অসুস্থতা এবং কাজের পথে বাধা। তাঁর মতে, জীবনের পথে এগুতে হলে মনে রাখা প্রয়োজন যে, ঈশ্বরবিহীন এ পৃথিবীতে করুণা বা নম্রতা নয় বরং কঠোরতাই একমাত্র ধর্ম। তবে ঈশ্বর যদি না থাকে তবে কী আছে? নীৎশের মতে আছে কেবল এই জীবনটুকুই। এই জীবনটুকু আছে হাতের মধ্যে এবং একে ইচ্ছে মত তৈরী করা যায়। নীৎশের মতে জীবন প্রতিবন্ধকতায়

---

14. F.W.Nietzsche, *Thus Spake Zarathustra*, Trans. by A. Tille, (London: J.M. Dent & Sons Ltd.,1960), p 53.
15. F.W.Nietzsche, *The Gay Science*, Ed. by Bernard Williams & Trans. by Josefine Nauckhoff (Cambridge: Cambridge University Press, 2008 7th printing), pp. 119-20, Section 125, The Madman. http://www.holybooks.com/wp-content/uploads/The-Gay-Science-by-Friedrich-Nietzsche.pdf

ও সংঘাতে পূর্ণ, জীবন ক্রুর ও কর্কশ। জীবনের কোনো পূর্ব নির্ধারিত অর্থ নেই। মানুষই ইচ্ছেমত জীবনকে অর্থপূর্ণ করতে পারে। প্রশ্ন হলো ইচ্ছা মানুষকে কোন দিকে তাড়িত করে? নীৎশের মতে ইচ্ছা মানুষকে ক্ষমতা বা শক্তি অর্জনের দিকে নিয়ে যায়। এ শক্তি অর্জনের জন্য প্রয়োজন হয় চারিত্রিক কঠোরতা। আর এর ভেতর দিয়ে সম্ভব হবে প্রচলিত নিয়ম-কানুন ও কর্তৃত্বের শেকল ছিড়ে পুরাতন ধ্যান-ধারণা, পাপ-পূণ্য, ভালো-মন্দ, বিবেক প্রভৃতি ধারণার পরিবর্তন সাধন। উল্লেখ্য, নীৎশে কিন্তু আক্ষরিক অর্থে ঈশ্বরের মৃত্যুর কথা কলেননি। বরং তিনি বলতে চেয়েছেন সমাজে মানুষের চলার জন্য ঈশ্বরের প্রয়োজন নেই। এই প্রয়োজনহীনতাকেই তিনি মৃত্যুর সাথে তুলনা করেছেন।

উল্লেখ্য যে, অস্তিত্ববাদের জনক কিয়ার্কেগার্ড (১৮১৩-১৮৫৫) ও নীৎশে উভয়ই ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাসী। তবে পার্থক্য হলো কিয়ার্কেগার্ডের চিন্তা ছিল ঈশ্বরমুখী। খ্রিস্টধর্মের আলোকেই তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন ব্যক্তিমানুষের স্বাধীনতা। নীৎশে ঠিক একই লক্ষ্য অর্জন করতে চেয়েছেন ভিন্ন উপায়ে; খ্রিস্টধর্মের সমালোচনা ও বিরোধিতা করে। তাঁর মতে, সুদীর্ঘ সময়কাল ধরে খ্রিস্টধর্মের প্রতি আস্থা মানুষের জন্য কল্যাণ বয়ে আনেনি। এবং খ্রিস্টীয় নৈতিকতা ক্ষমতার ইচ্ছার পরিপন্থী এবং তা মানবতাকে আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে পঙ্গু করে তুলেছে। প্রসঙ্গক্রমে রাধাকৃষ্ণাণ উল্লেখ করেন, "His whole criticism of current morality and religion is that they do not give proper scope for the exercise of the will."[16]

নীৎশে তাঁর নৈতিকতায় কেবল পার্থিব জীবনেরই মূল্য স্বীকার করেছেন। তাঁর এ চিন্তা গঠনে হেরাক্লিটাসের পরিবর্তনের দর্শনের প্রভাব রয়েছে মনে হয়। কারণ হেরাক্লিটাসের মত জগতের অবিরাম পরিবর্তনশীলতার উপর তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর মতে মানুষের চিন্তা সব সময় এই সর্বদা পরিবর্তনশীল অস্তিত্বের মধ্যে অপরিবর্তনীয় ও নিত্যতার অনুসন্ধান করে। এ কারণেই ঈশ্বর, সত্তা, বিমূর্ত ধারণা, দেব-দেবী, পূর্বপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম-নীতি, প্রাতিষ্ঠানিক কর্তৃত্ব প্রভৃতির চিত্র কল্পণা করা হয়। পরিবর্তনের উপর স্থিতিকে এবং বিশেষের উপর সার্বিকের প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। এমনিভাবে চেতনা অস্তিত্বকে বিকৃত করে। চেতনার সঙ্গে অস্তিত্বের এ দ্বন্দ্বের কোনো শেষ নেই। অস্তিত্বের কার্যকারণহীনতা, শৃঙ্খলাহীনতা, উদ্দেশ্যহীন বহমানতাকে মেনে নেবার ক্ষমতা বেশিরভাগ মানুষের নাই। তাই নীৎশে মনে করেন সাধারণ মানুষ ধর্ম, প্রতিষ্ঠান,

16. S. Radhakrishnan, *History of Philosophy Eastern and Western*, P. 293.

নিয়ম-নীতি, প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত ধ্যান-ধারণায় আশ্রয় খোঁজে। এসব মানুষের নিকট সত্যের চেয়ে নিরাপত্তা এবং অবিরাম জিজ্ঞাসার চেয়ে সুনিশ্চিত উত্তর বেশি কাঙ্ক্ষিত। কিন্তু চেতনার চেয়ে অস্তিত্ব অনেক বেশি প্রবল, সর্বব্যাপী ও আদিঅন্তহীন। ফলে মানুষ ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, উচিৎ-অনুচিতের যে সর্বজনীন মানদন্ড তৈরী করে কিংবা ধর্ম ও বিজ্ঞানের মাধ্যমে যে সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে তোলে পরিবর্তনশীল অস্তিত্বের কারণে বারবার তা বিলুপ্ত হয়। তাই নীৎশের পর্যবেক্ষণে ইতিহাসে প্রগতি বলে কিছু নেই, আছে দ্বন্দ্বময় পৌনঃপুনিক চক্রগতি, আছে আদিমতা ও সভ্যতার ক্রমিক আবর্তন। ইতিহাসে কোনো নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি কিংবা উদ্দেশ্যপূর্ণ ভবিষ্যৎ যাত্রা নেই। নীৎশের মতে অবিরাম পরিবর্তনশীল জগতে কোনো স্থায়ী সম্পর্ক অসম্ভব। এছাড়া পরিবর্তনশল অনিত্যকে নিয়ে নির্ভরযোগ্য ধারণা, নিয়ম, ধর্ম, বিজ্ঞান দাঁড়াতে পারেনা। এবং এ উদ্দেশ্যহীন, অর্থহীন, নিরন্তর প্রবাহে উচিত-অনুচিত, ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্যকরণ অসম্ভব। এরকম অবস্থায় জগতে নৈতিকতার কোনো সর্বজনীন ও নিত্য মানদণ্ড থাকতে পারে না। নৈতিকতার যেসব আদর্শ প্রচলিত রয়েছে তার সবই উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়, ভঙ্গুর ও আপেক্ষিক। নৈতিকতাসহ জগৎ সম্পর্কে এসব সত্য জানার জন্য নীৎশে সাধারণ মানুষকে উপযুক্ত বলে মনে করেননি। তাঁর মতে কেবল প্রকৃত দার্শনিক ও শিল্পীরাই নিরন্তর জিজ্ঞাসার মাধ্যমে এ সত্যকে জানতে পারেন।

নীৎশের নৈতিকতার আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ধর্মের কঠোর সমালোচনা। তিনি ধর্মকে প্রাণের অবিচ্ছন্ন পরিবর্তনশীলতার বিরোধী বলে মনে করতেন। তাঁর যুক্তি হলো; ধর্ম মানুষকে জীবনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় না, ধর্ম মানুষের জিজ্ঞাসাকে স্তব্ধ করে দেয়, সবরকম পরিবর্তনকে ঠেকিয়ে রাখতে চায়, ভয় ও লোভ দেখিয়ে মানুষকে পেছনের দিকে ঠেলে দেয়, ফলে মানুষ আরো নাবালক হয়ে পড়ে। নীৎশের মতে যারা পরিবর্তনশীল অস্তিত্বের মুখোমুখি হতে ভয় পায় এবং যারা নিরন্তর জিজ্ঞাসার বদলে নিশ্চিত উত্তর খোঁজে ধর্ম তাদের অবলম্বন। সব সমাজে শক্তিমান বা শাসকেরা ধর্মের নামেই বিভিন্ন নীতি-নৈতিকতা, আচার অনুষ্ঠান প্রচলন করে দূর্বল ও শাসিতদের মনে দাসমূলক মনোভাব সৃষ্টি করে। অন্যদিকে, দূর্বলেরা ধর্মবিশ্বাসের সহায়তায় তাদের ব্যর্থতাকে ঢাকতে চেষ্টা করে। নীৎশে সব ধর্মকে আক্রমণ করলেও তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল খ্রিষ্টধর্ম। তাঁর মতানুসারে খ্রিষ্টধর্মের জন্ম হয়েছে দাসমনোভাব থেকে এবং খ্রিষ্টধর্মের প্রসারের ফলে জনজীবনে দাসবৃত্তি হয়েছে নৈতিকতার ভিত্তি।

ধর্মবোধকে মানুষের শৈশবকালীন ও সভ্যতার আদিম যুগের অভ্যাস হিসেবে চিহ্নিত করে নীৎশে অভিমত প্রকাশ করেন যে- এ অভ্যাসকে অতিক্রম করে মানুষকে পরিণতমনস্ক হতে হবে। এজন্য শারীরিক ক্ষমতার প্রয়োজন হলেও সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হলো মানসিক শক্তি অর্জন। এ মানসিক শক্তি দিয়েই প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত প্রাচীন মুল্যবোধ ও কর্তৃত্বের শেকল ভেঙ্গে, প্রচলিত পাপ-পুণ্যের ধারণাকে বিসর্জন দেওয়া সম্ভব হবে। এভাবে মানুষ এগিয়ে যাবে অতিমানব এর সত্তার দিকে। নীৎশে বলেছেন, "আমি অনুরোধ করি, শোন, বিশ্বাস কর পৃথিবীকে। বিশ্বাস করো না তাদের, মিথ্যা এক অপার্থিব স্বর্গের আশা দিয়ে যারা প্রবঞ্চিত করে মানুষকে। মানুষের জীবনে বিষ ছড়ায় তারা– হয়তো জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে।"[১৭] *জরথুস্ত্র* গ্রন্থে তিনি জরথুস্ত্রের জবানীতে আরো বলেন, "শোন বন্ধু, তুমি যে নরকের কথা বলছ, আমাকে বিশ্বাস কর, কোথাও নেই তার কোনো অস্তিত্ব। নেই কোনো নরক, নেই কোনো শয়তান। তোমার দেহের মৃত্যু ঘটবার পূর্বেই ঘটবে তোমার চেতনার মৃত্যু। অতএব ভীত হওয়ার কোনো কারণ নেই।"[১৮] খ্রিস্টীয় নৈতিকতায় মানুষের অবমূল্যায়নের জন্য নীৎশে যিশুকে দায়ী না করে সেইন্ট পলকে দায়ী করেছেন। গ্রিক পুরাণে অন্যতম দুই দেবতা ডায়োনিসাস এবং অ্যাপোলো। ডায়োনিসাস আবেগ, উন্মাদনা আর আতিশয্যের প্রতীক। অন্যদিকে, অ্যাপোলো হলেন পরিমিতি বোধ, স্বচ্ছতা, যুক্তিনিষ্ঠা,সৌন্দর্যের প্রতীক। নীৎশের দৃষ্টিতে ডায়োনিসাস ও অ্যাপোলো দেবতার ন্যায় যীশুও ছিলেন অনন্ত সত্তার প্রতীকস্বরূপ।

নীৎশের নৈতিকতার আরেকটি দিক হলো নারীর প্রতি ঘৃণা। তিনি নারীকে অত্যন্ত অমর্যাদাকরভাবে তুলে ধরেছেন তার লেখাগুলোতে। জরথুস্ত্র গ্রন্থে তিনি বলছেন নারীরা বন্ধু হতে পারে না, তারা মার্জার, পাখী অথবা খুব বেশি হলে গরুর মত। *পাওয়ার* গ্রন্থে নীৎশে বলেছেন, আমরা নারীকে সৌন্দর্য্য, কমনীয়তা বা বায়বীয় সত্তার প্রতীক হিসেবে দেখে আনন্দ পাই। এমন প্রাণী যারা কেবল নাচতে পারে, বাজে বকে, বেশভুশা পছন্দ করে। তাদের সঙ্গ লাভে কী লাভ। আর নারীদের এসব বৈশিষ্ট্য তখনই প্রকাশ পায় যখন তারা পুরুষের অধীন

17. F.W.Nietzsche, *Thus Spake Zarathustra*, p.6. এ উদ্ধৃতিটির অনুবাদের জন্য সাহায্য নেওয়া হয়েছে মহীউদ্দীন অনুদিত ফ্রেডারিক নীটশে, *জরথুস্ত্র বললেন* (ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ,২০১৪ তৃতীয় মুদ্রণ), পৃ. ২২।
18. F.W.Nietzsche, *Thus Spake Zarathustra*, p.11. এ উদ্ধৃতিটির অনুবাদের জন্য সাহায্য নেওয়া হয়েছে মহীউদ্দীন অনুদিত ফ্রেডারিক নীটশে, *জরথুস্ত্র বললেন*, পৃ. ২৮।

থাকে। স্বাধীনতা পেলেই অসহনীয় হয়ে উঠে। এছাড়া *বিয়ন্ড এন্ড এভিল* গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেনে যে প্রাচ্যের মানুষ নারীদের সম্পত্তি ভাবে এবং এ ভাবনাটি সঠিক। নারীদের সম্পত্তি ভাবাই উচিৎ।

৪. অতিমানব তত্ত্ব

নীৎশের ক্ষমতার দর্শনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো অতিমানবের (ubermenscs/superman) সৃষ্টি, তাঁর 'অতিমানব তত্ত্ব'। *জরথুস্ত্র* গ্রন্থে জরথুস্ত্র বলছেন "আমি তোমাদের অতিমানবের শিক্ষা দেব। মানুষ একটি অবস্থা, একে অতিক্রম করে উঠতে হবে উপরে। তোমরা কী করছো তাকে ছাড়িয়ে যাবার জন্য?"[১৯] নীৎশে মনে করতেন ঈশ্বরবিহীন জগতে মানুষ নিজেই হয়ে উঠবে নিজ ভাগ্যের নিয়ন্ত্রক। যে ঈশ্বরের মৃত্যু ঘোষণা নীৎশে করেছেন সে ঈশ্বর খ্রিষ্টান ধর্মের ঈশ্বর, এই এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরই জীবন ও জগতের স্রষ্টা এবং সকল নিয়মের প্রণেতা। নীৎশে এই একশ্বরবাদকে ঘৃণা করতেন কারণ এই একেশ্বরবাদ একটি মাত্র সত্যকে স্বীকার করে। এই একেশ্বরবাদের বদলে নীৎশে পছন্দ করতেন প্যাগান বহুদেবতাবাদকে। কারণ এই বহুদেবতাবাদে বহু মতের স্বীকৃতি রয়েছে। নীৎশে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সমর্থক। ব্যক্তিমানুষের স্বাধীনতায় তিনি বিশ্বাস করতেন। প্রশ্ন হলো মানুষ কী বা মানুষের মূল বৈশিষ্ট্য কী? নীৎশের মতে প্রতিনিয়ত নিজেকে অতিক্রম করে চলাই মানুষের ধর্ম। এই আত্ম অতিক্রমণই মানুষকে অতিমানবে পরিণত করবে বলে নীৎশে মনে করতেন। নীৎশে অতিমানবের কোনো সংজ্ঞা দেননি, আর তা দেওয়াও সম্ভব নয়। কারণ কোনো কিছুর সংজ্ঞা দিলে তার অর্থ নির্ধারিত হয়ে পড়ে এবং সম্ভাবনাহীন জড়বস্তুতে পরিণত হয়। অবশ্য নীৎশে মনে করেন বেশির ভাগ মানুষই সম্ভাবনাহীন জড়বস্তুর মত জীবন অতিবাহিত করে। কিন্তু এই মানুষের মধ্য থেকেই অতিমানবের আবির্ভাব হবে বলে নীৎশে মত প্রকাশ করেন। পশু এবং অতিমানবের মাঝে সেতু হিসেবে মানুষকে বিবেচনা করেছেন নীৎশে। তিনি মনে করতেন মানুষের মধ্যে একদিকে আছে যেমন পশুসত্তা, তেমনি আছে সৃষ্টিশীল সত্তা। সৃষ্টিশীল মানুষ পশু-মানুষকে অতিক্রম করে ক্রমেই অতিমানব হয়ে উঠবে বলে নীৎশে বিশ্বাস করতেন। জরথুস্ত্রের জবানীতে নীৎশে বলছেন "আমি মানুষকে শিক্ষা দেব

19. F.W.Nietzsche, *Thus Spake Zarathustra*, p.5.

অতিমানব হবার মহান শিক্ষা। অতিমানব হচ্ছে মানুষের ঘনীভূত কালো মেঘ থেকে নির্গত বিদ্যুৎ।"[২০]

নীৎশে হলেন একজন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী চিন্তাবিদ। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে ব্যক্তি মুখ্য, সমাজ গৌণ এবং ব্যক্তির প্রয়োজনেই সমষ্টি বা সমাজ। নীৎশের দর্শনে সমাজের কল্যাণে ব্যক্তির বলিদান লক্ষ্য করা যায় না, বরং সমাজে মানুষের প্রকৃতগত স্বাতন্ত্র্য তাঁর চিন্তায় গুরুত্ব পেয়েছে। এক্ষেত্রে নীৎশের চিন্তা লাইবনিজের চিৎপরমাণুর দর্শনের সাথে তুলনাযোগ্য। লাইবনিজের চিৎপরমাণু তত্ত্বে দেখা যায় সত্তা এক নয়, বহু এবং এ বিশ্বজগত অসংখ্য অবিভাজ্য স্বতন্ত্র চিৎপরমাণু দিয়ে গঠিত। এই চিৎপরমাণুগুলো সত্তার দিক থেকে জড় নয়, চেতনময়। চিৎপরমাণুগুলো স্বতন্ত্রভাবে এবং নিরপেক্ষভাবে জগতকে প্রত্যক্ষ করে। লাইবনিজের এই চিৎপরমাণুর দর্শনের সাথে ঈশ্বরের মৃত্যু ঘোষণা করে নীৎশে ব্যক্তির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য তুলে ধরলেন। তাই বলে সব মানুষের মধ্যেই যে এই স্বাতন্ত্র্য সব সময়ই থাকবে একথা নীৎশে মনে করতেন না। তাঁর মতে, সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষ, যাদের মধ্যে কোনো স্বাতন্ত্র্য নেই তারা সকলে মিলে হয় জনতা। নীৎশে এ জনতাকে পশুর পালের সাথে তুলনা করেছেন।[২১] স্বাতন্ত্র্যহীনতা পশুর পালের ধর্ম। সাধারণত পালের গোদা যেদিকে যায় অভ্যাসবশত পালের অন্যান্য পশুরাও তাকে অনুসরণ করে। কোনো পশুর মধ্যেই স্বতন্ত্র ভাবনা কাজ করে না। নীৎশের মতে যে ব্যক্তি হিসেবি এবং সাবধানী হয়ে জীবন-যাপন করে এ জটিল পৃথিবী তাকে সহজভাবে গ্রহণ করে। কিন্তু নানা ধরনের সঙ্কট ও সেই সঙ্কট সামাধানে এবং বহু সম্ভাবনার খোঁজে যাঁরা স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে চিন্তা করেন, তাঁরাই অসহায় হয়ে পড়েন। সমাজ তাঁদের সন্দেহের চোখে দেখে। অথচ এই স্বতন্ত্র ভাবনার মধ্যেই রয়েছে জ্ঞানের গভীরতা ও আধুনিকতা। নীৎশে মনে করেন সাধারণ জনগণও স্বতন্ত্র ভাবনা-চিন্তাকে স্বীকৃতি দেয় না। যেসব মানুষ ব্যতিক্রমধর্মী ও স্বতন্ত্র চিন্তা-ভাবনা করে সমাজ প্রচলিত নিয়ম-কানুনের মানদণ্ডে তাদের বিচার করে, একঘরে করে রাখে, কখনো কখনো নির্বাসন দেয়। তবে কোনো একজন ব্যক্তি যদি সকল প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে নতুন কোনো নিয়ম বা নতুন কোনো মূল্য সৃষ্টি করতে পারে তখন জনতা তাঁর দাসে পরিণত হয়। সে যা আদেশ করে জনতা তাই পালন করে। এ স্বতন্ত্র ব্যক্তিই অতিমানব। নীৎশে এক নতুন আলোর সান্ধানের দাবী করেছেন; যেখানে

---

20. *Ibid.*, p.12.
21. *Ibid.*, p.14.

তিনি জনতা বা পশুর পালের রাখাল বা কোনো মৃতদেহ কিংবা কোনো ধর্মবিশ্বাসী কাউকে নয় বরং জীবনের সহচর হিসেবে চেয়েছেন জীবন্ত কাউকে, যারা হবে সৃষ্টিশীল। তিনি বলছেন,"নির্মাতা, আহরণকারী, জীবন উল্লাসে উল্লসিত ব্যক্তিরাই হবে আমার জীবনের সাথী। আমি তাদেরকে দেখাব জীবনের রংধনু এবং দেখাব অতিমানবে পৌঁছানোর সিঁড়ি।"[২২] জড়বস্তুর মতো যাদের জীবন, যারা অলস তাদের ডিঙ্গিয়ে জীবন চলার পথ সৃষ্টির প্রচেষ্টা নীৎশের চিন্তায় লক্ষ্য করা যায়। প্রশ্ন হলো অতিমানবের সৃষ্টি হবে কীভাবে? নীৎশে মনে করেন সঠিক জন্ম, ইচ্ছা, উদ্যম ও সঠিক শিক্ষা প্রভৃতি একজন ব্যক্তিকে অতিমানবের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। নীৎশে মনে করতেন সঠিক জন্ম নির্ভর করে সঠিক বিবাহের উপর। এজন্য তিনি অভিজাত সঙ্গিনী পছন্দের উপর জোর দিতেন। সঠিক শিক্ষা মানুষকে কষ্ট সহিষ্ণু ও দায়িত্ববান করে তুলবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। নীৎশে তাঁর অতিমানবের চরিত্রে যে গুণগুলো আরোপ করেছিলেন সেগুলি এরকম- জীবনকে ভালোবাসে, প্রবল ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন, নির্ভীক, ধীরস্থির, প্রসন্নচিত্ত, আত্মনির্মাণে সক্ষম, প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত নিয়ম-বিশ্বাস-মূল্যবোধের পূনর্মুল্যাণে বিশ্বাসী, শিল্প ও সৌন্দর্যের স্রষ্টা, ভোক্তা, স্বাধীন, অনিয়ন্ত্রিত ও অভিজাত।

বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য অতিমানবের শক্তির প্রয়োজন রয়েছে বলে নীৎশে মনে করতেন। এ শক্তি অর্জনের জন্য প্রয়োজনে ন্যায়নীতির বিসর্জনকে তিনি অন্যায় মনে করেননি। কারণ 'শক্তিতত্ত্ব' সব ধরনের ন্যায়-নীতি, ভালো-মন্দের উর্ধে। কারণ এগুলো শক্তি লাভের পথে বাধা স্বরূপ। নীৎশের মতে, মন্দ লোকেরা সমাজের যত না ক্ষতি করে, নীতিবান, সৎ বা ভালো লোকেরা নতুন কোনো কিছু তো সৃষ্টি করেই না বরং যারা করে তাদের পথে বাধা সৃষ্টি করে। প্রেম দিয়ে মানব জাতিকে একসাথে আবদ্ধ করার কথা নীৎশে কল্পনায়ও আনেননি। তাঁর মতে প্রেমের মহিমা কীর্তন কাপুরুষতার লক্ষণ। প্রেম দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অন্যের নিকট মাথা নত করা কিংবা জীবন সংগ্রাম হতে বিরত হয়ে মানব জাতির ভবিষ্যতকে বিসর্জন দেওয়া অতিমানবের গুণ নয় বলে নীৎশে মনে করেন। বরং তার মতে অতিমানবের শক্তির নিকট সারা পৃথিবীর মানুষ মাথা নত করবে। এবং এরকম শক্তিমান ব্যক্তির দ্বারাই কেবল বিশ্বের কল্যাণ সম্ভব হবে।

নীৎশে আশা করেন যে, তার প্রস্তাবিত অতিমানবে আবেগের সঙ্গে চিন্তা, আচরণ ও শিল্পকলার এক চমৎকার সমন্বয় গড়ে উঠবে। আবির্ভাব ঘটবে আনন্দ

---

22. *Ibid.*, p.14.

ও গৌরবের সঙ্গে বেঁচে থাকার ইচ্ছা। এভাবেই গড়ে উঠবে এক নতুন জাতির, এক বিশ্বজনীন সংস্কৃতি ও সভ্যতার। দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার নির্যাতনের অবসান ঘটবে, পতন ঘটবে খ্রিস্টীয় ঈশ্বরের। ক্ষমতায় আবির্ভূত হবেন একজন অতিমানব যিনি পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন। তিনি প্রটাগোরাসের মত 'মানুষই সব কিছুর পরিমাপক' এটিকে কিছুটা পরিবর্তন করে গ্রহণ করেন। রাধাকৃষ্ণাণ উল্লেখ করেন, "He therefore accepts the protagorean doctrine with a change: Not man, but *the* man, is the measure of all things."[২৩] নীৎশের মতে, ইতিহাসের যে পরিবর্তন তা সাধারণ মানুষের মাধ্যমে হয় না, হয় একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি, অতিমানব তথা বীরপুরুষের কল্যাণে। এখানে মানুষ লক্ষ্য নয়, বাহন। তাঁর ভাষায়, "মানুষ একটি দড়ি। এ দড়ি বিস্তৃত রয়েছে দুই প্রান্তে। এর এক প্রান্তে মানুষ, অন্য প্রান্তে মহামানুষ। আর নিচে রয়েছে ভয়াবহ গহ্বর।... মানুষের মহত্ত্ব এইখানে যে মানুষ একটি পথ-কিন্তু পথের শেষ লক্ষ্যস্থল নয়। এ জন্যই তাকে ভালোবাসা যায়, কেননা সে ক্ষণজীবী, সে মৃত্যুশীল।"[২৪]

৫. গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে

নীৎশের ক্ষমতার দর্শনে লক্ষণীয় বিষয় হলো রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে গণতন্ত্রের বদলে অভিজাততন্ত্রের প্রতি ঝোঁক। তাঁকে নিয়ে নানা ধরনের বিতর্কে অন্যতম কারণ হলো এটি। কারণ আধুনিক সমাজব্যবস্থায় যেখানে গণতন্ত্র ও সাম্য সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ও মানবিক আদর্শ হিসেবে স্বীকৃত সেখানে নীৎশের অবস্থান ভিন্ন। এই দুই আদর্শকে তিনি ঘৃনা করতেন। নীৎশের সময়কালে গণতন্ত্রের প্রসার ঘটলেও তিনি ছিলেন এর ঘোর বিরোধী ছিলেন। জনগণকে সার্বভৌম বলে গণ্য করাকে তিনি নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক বলে মনে করতেন। তাঁর মতে, গণতন্ত্র ব্যক্তিকে পর্যবসিত করে অতিক্ষুদ্র, গোলাকার, পলকা বালুকণায়, এবং গণতন্ত্রে সবাই তুলনাযোগ্য। সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ নিকৃষ্টরা সংখ্যালঘিষ্ঠ প্রতিভাবানদের ধ্বংস করে গুণহীন ও সাধারণ গড়পড়তা মানের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। তিনি মনে করেন, উৎকৃষ্টদের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা ও প্রয়োগ ব্যতীত সভ্য সমাজ সম্ভব নয়। তাঁর মতে, শাসকদের কাজ হল শক্ত হাতে দেশকে শাসন করা এবং জনগণকে সরকারের প্রতি আস্থাশীল ও অনুগত থাকতে বাধ্য করা। নীৎশে প্রত্যাশা করেছিলেন এমন এক লৌহমানবের যিনি প্রবর্তন করবেন পূর্ণ

23. *Ibid.*, P.294.
24. *Ibid.*, p.7.

একচ্ছত্রবাদ। একই সাথে স্বপ্ন দেখেছিলেন এমন এক বিশ্ব সৃষ্টির, যার ফলে সকল চিন্তাবিদ পোষণ করবেন বিশ্বজনীন মনোভাব। সত্যিকার অর্থে নীৎশের দর্শনের মূল বিষয় হল ক্ষমতার প্রতি ইচ্ছা এবং ধর্মীয় নৈতিকতার খণ্ডনের ভেতর দিয়ে অতিমানব তথা বীরতন্ত্রের জয়গান। এস. রাধাকৃষ্ণাণ উল্লেখ করেন, "What he as in fact done is to show that the will to power is the only truth and the superman the only good."[২৫]

গণতন্ত্র, সাম্য ও মানবিকতা প্রসঙ্গে নীৎশের এ অবস্থানের কারণে তাঁকে নিয়ে বিতর্ক। এবং এ বিতর্ক চরম আকার ধারণ করেছিল বিশ শতকের শুরুতে হিটলার ও তার অনুসারীরা যখন নীৎশেকে আর্য শ্রেষ্ঠতায় বিশ্বাসী জার্মান জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। এবং নাৎসী একনায়কতন্ত্রের সঙ্গে নীৎশের অতিমানবের তত্ত্বের সমীকরণ সাধনের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো নীৎশে কি জাতীয়তাবাদী ছিলেন? সত্যিকার অর্থে, নীৎশের রচনায় কোথাও নিজ জন্মভূমি জার্মান নিয়ে কোনো বাড়াবাড়ী লক্ষ্য করা যায় না। বরং জার্মান জাতিকে তিনি বারবার কঠোর ভাষায় আক্রমণ করেছেন। জাতীয়তাবাদকে তিনি ঘৃণা করতেন। তিনি গণতন্ত্রের বিরোধিতা করলেও জাতীয়তাবাদের পুজা কখনো করেননি। এর প্রমাণ পাওয়া যায় নিম্নোক্ত ঘটনায়; *ট্র্যাজেডির জন্ম* লেখার সময় ফ্রাঙ্কোপ্রুশীয়া যুদ্ধে বিজয়ী বিসমার্ক যখন ভার্সাইজ এর চুক্তিতে জার্মান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করেন তখন নীৎশে সেই ঘটনাকে বর্ণনা করেছিলেন 'সামরিক আইনের কৃত্রিম জাতীয়তাবাদ' হিসেবে, যা রক্ষার জন্য প্রয়োজন হয় চালাকি, মিথ্যাচার ও অস্ত্রশক্তি। জাতীয়তাবাদকে নীৎশে তুলনা করেছেন 'শিংওয়ালা জানোয়ার জাতির ধর্ম' হিসেবে। অন্য আর এক যায়গায় তিনি লিখেছেন 'ভালো জার্মান হতে হলে আগে অ-জার্মান হতে হবে'। এছাড়া, তিনি যাদের অতিমানব বলে ভেবেছেন তারা কেউই কোনো নির্দিষ্ট দেশ বা জাতির নয়। তিনি যে নতুন সমাজের কথা বলেছেন সেটি বৈশ্বিক, কোনো রাষ্ট্রকেন্দ্রিক নয়। বিশ্বকে শাসন করতে পারবে এমন একটি আন্তর্জাতিক অভিজাত শাসক গোষ্ঠী ছিল তাঁর আকাঙ্ক্ষিত। অথচ হিটলার এবং তার নাৎসী পার্টি অতিমানবের দর্শনের ভেতরে খুঁজে নিয়েছিলেন জার্মানীর শ্রেষ্টত্বের দর্শন। নীৎশে অতিমানবে যে বৈশিষ্ট্য আরোপ করেছিলেন হিটলার এবং তার অনুসারীদের মধ্যে তার অনেককিছুই অনুপস্থিত ছিল। তাই কোনোভাবেই নীৎশেকে নাৎসীবাদের প্রবর্তক বলা যায়না। তবে যেহেতু নীৎশে সমাজে নারী-পুরুষের সমতায় বিশ্বাস করতেন না, বরং প্রচণ্ড

---

25. S. Radhakrishnan, *History of Philosophy Eastern and Western*, P. 295.

নারীবিদ্বেষী ছিলেন। তাই একদিকে গণতন্ত্রের বিরোধিতা অন্যদিকে সাম্যের বিরোধিতার কারণে সমালোচকরা তাঁকে নাৎসীবাদের তাত্ত্বিক চিন্তক হিসেবে চিহ্নিত করতেন।সত্যিকার অর্থে, নীৎশে ইহুদি বিদ্বেষী ছিলেন না। এখানেই জার্মান ফ্যাসিবাদের সাথে তাঁর পার্থক্য।

৬. ক্ষমতা: নীৎশে, মেকিয়াভেলী, মার্কস, রাসেল

নীৎশে ও মেকিয়াভেলীর মধ্যে অনেক বিষয়ে পার্থক্য থাকলেও তাদের চিন্তধারার মধ্যে তুলনা করা যায়। মেকিয়াভেলী ছিলেন ব্যবহারিক জীবনে বিষয়বোধ সম্পন্ন ব্যক্তি। সমাজের মানুষের সাথে যোগাযোগের ফলে মানুষের মতামত তাঁর চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত করতো, সমসাময়িক কালের সাথে তাঁর একটা ঐক্য লক্ষণীয় এবং তিনি নিয়ম বিরুদ্ধ ছিলেন না। অন্যদিকে, নীৎশে ছিলেন একজন খাঁটি গ্রন্থমগ্ন ব্যক্তি এবং চিন্তাবিদ হিসেবে তিনি ছিলেন তাঁর সময়ের প্রচলিত সকল রাজনৈতিক ও নৈতিক মতের বিরোধী। তবে উভয়ের মধ্যে মিলও আছে। মেকিয়াভেলীর *The Prince* গ্রন্থের রাজনৈতিক বক্তব্যের সঙ্গে নীৎশের রাজনৈতিক চিন্তার সাদৃশ্য রয়েছে। নীৎশে ও মেকিয়াভেলী উভয়েরই একটি নৈতিক আদর্শ ছিল যা ক্ষমতাকেন্দ্রিক এবং সুচিন্তিত ও সচেতনভাবে খ্রিস্টধর্ম বিরোধী।

নীৎশে ও মার্কস দু'জনের মধ্যে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষণীয়। তাঁরা দু'জনই নাস্তিক ও ধর্মবিরোধী। দ্বন্দ্বকে দু'জনই ইতিহাসের মূলসূত্র হিসেবে দেখেছেন। দু'জনের চিন্তায় তাত্ত্বিক ধ্যান-ধারণা ও নৈতিক বিশ্বাস আপেক্ষিক। দু'জনই বুর্জোয়া সংস্কৃতির উচ্ছেদের পক্ষে। দু'জনই সমাজে সংস্কারের প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগ ও রক্তপাতে দ্বিধাহীন। তবে তাঁদের মধ্যে পার্থক্য হলো মার্কস যেখানে প্রগতিতে আস্থাশীল এবং শ্রমিক তথা প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর সংগ্রামের মধ্য দিয়েই এ প্রগতি আসবে বলে নিশ্চিত ছিলেন। সেখানে নীৎশে ইতিহাসকে দেখেন দ্বন্দ্বের অনিঃশেষ চক্র হিসেবে। এবং সভ্যতার এ সঙ্কট থেকে সাময়িকভাবে উদ্ধারকর্তা হিসেবে শক্তিমান অতিমানবের কল্পণা করেন। তবে মার্কসীয় সমাজতন্ত্র যেমন রাশিয়ায় বলশেভিকদের দ্বারা বিকৃত হয়েছিলো তেমনি জার্মানীতে হিটলারের নাৎসীবাদের দ্বারা নীৎশের অভিজাততন্ত্র বিকৃত হয়েছিলো।

নীৎশের মত রাসেলও ক্ষমতাকে সমাজের সমস্ত পরিবর্তনের মৌল বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[২৬] তবে নীৎশে যেখানে ক্ষমতাকে সদর্থকতভাবে গ্রহণ করে শক্তি অর্জনের মধ্য দিয়ে অতিমানবে পৌঁছানোর চিত্র অঙ্কন করেছেন সেখানে রাসেল ক্ষমতার অশুভ আকাঙ্ক্ষার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সমাজ-রাষ্ট্রে কল্যাণের কথা ভেবেছেন।[২৭] রাসেল নীৎশেকে ক্ষমতাতাড়িত দার্শনিক হিসেবে তীব্রভাবে সমালোচনা করেছেন। রাসেলের যুক্তি হলো নীৎশে একটি সমগ্র জাতির দুঃখের তুলনায় একজন অতিমানবের দুঃখকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে।[২৮] আবার, নীৎশে যাদের প্রশংসা করেছেন তারা সকলে সামরিক ব্যক্তি। এবং যে প্রবল ক্ষমতার ইচ্ছার কথা নীৎশে বলেছেন তা ভয় থেকে সৃষ্টি। অথচ এই ক্ষমতা তিনি তাঁর অতিমানবকে দিতে চান। নীৎশে সম্পর্কে রাসেলের আরো অভিযোগ হলো নীৎশে বাইবেলে বর্ণিত খ্রিস্টীয় নৈতিকতাকে দাসসূলভ মনে করে একদিকে বাতিল করে দিচ্ছেন অন্যদিকে তার পরিবর্তে প্রবর্তন করছেন অতিমানবের উপযোগী নৈতিক মত।[২৯] এছাড়া, নীৎশের নৈতিকতার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ ও শাসক সমানভাবে বিচার্য নয়। সাধারণ মানুষের কোনো স্বকীয় মূল্য নেই, অতিমানব বা শাসকের মহত্ত্ব অর্জনের উপায় হিসেবে এর মূল্য রয়েছে। অতিমানব নিজের উন্নতির জন্য সাধারণ মানুষকে আহত করার অধিকারও রাখেন। রাসেলের মত হলো ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক অংশ, কিন্তু ক্ষমতাতাড়িত দার্শনিকেরা সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট অর্থে প্রকৃতস্থ নন।[৩০] তবে উপরের আলোচনায় দেখা যাচ্ছে নীৎশে সম্পর্কে রাসেলের এ ব্যাখ্যা আজ নতুনভাবে পূণর্মুল্যায়িত হচ্ছে।

৭.

---

26. Bertrand Russell, *Power – A New Social Analysis* (London: G. Allen & Unwin Ltd., 1938), p.10.
27. দ্রষ্টব্য: ড. মো. আরিফুল ইসলাম, 'বার্ট্র্যাণ্ড রাসেলের চিন্তায় ক্ষমতার ধারণা', *অন্বেষণ*, পঞ্চদশ সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০১৬, পৃ. ৪৩-৬০। এছাড়া ক্ষমতার প্রকৃতি ও তা নিয়ন্ত্রণ করে কীভাবে ব্যক্তিমানুষের জন্য একটি কল্যাণমূলক ও প্রগতিশীল সমাজ নির্মাণ করা যায় এ বিষয়ে রাসেল বিভিন্ন গ্রন্থ ও লেখায় আলোকপাত করলেও বিস্তারিত ভাবে পরিকল্পণা তুলে ধরেন *Power – A New Social Analysis* গ্রন্থে।
28. Bertrand Russell, *History of Western Philosophy*, pp. 731-32.
29. Russell, *Power- A New Social Analysis, p.*269.
30. *Ibid.*,268.

উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে দেখা যাচ্ছে যে নীৎশের চিন্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সমাজের সমস্ত পরিবর্তনের মূলে মানুষের ক্ষমতা লাভের ইচ্ছাকে চিহ্নিতকরণ। যেখানে তিনি মনে করেন মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্য-শিল্পকলা-সংস্কৃতি প্রভৃতি চর্চার মূল লক্ষ্য হলো ক্ষমতা অর্জন। এ ক্ষমতার ইচ্ছার পরিপন্থী হওয়ায় নীৎশে কান্টের 'কৃচ্ছতা সাধনতত্ত্ব', মিল ও বেনথামের সুখবাদ এবং খ্রিষ্টীয় নৈতিকতা অস্বীকার করেছেন। বিশেষ করে মানুষকে নৈতিকভাবে দাসে পরিণত করা জন্য তিনি খ্রিষ্ট ধর্মের প্রেম, বিনয়, করুণা, ভদ্রতা, দয়া প্রভৃতি শিক্ষাকে দায়ী করেছেন। পরিবর্তনশীল এ জগতে নৈতিকতার কোনো নিত্য ও সর্বজনীন মানদণ্ড নেই, নৈতিকতা উপর থেকে চাপানো ও আপেক্ষিক। নীৎশের এই ক্ষমতার দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো অতিমানবের সৃষ্টি। তিনি জগতে ঈশ্বরের প্রয়োজনীতাকে অস্বীকার করেছেন। তিনি মনে করতেন জগতে মানুষ নিজেই হয়ে উঠবে নিজ ভাগ্যের নিয়ন্ত্রক। কারণ প্রতিনিয়ত নিজেকে অতিক্রম করে চলাই মানুষের স্বভাবধর্ম। এই আত্ম অতিক্রমণই মানুষকে অতিমানবে পরিণত করবে। বিশ্বের সকল মানুষের মঙ্গলের জন্য এমন একজন অতিমানবের প্রয়োজনীয়তা নীৎশে গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেন। আবার, বিশ শতকে জার্মানীতে হিটলার ও তাঁর নাৎসী পার্টি তাদের রাজনৈতিক চিন্তার পথ প্রদর্শক হিসেবে নীৎশেকে তুলে ধরেছিলেন। নীৎশে ও নাৎসীবাদ এক সময় সমার্থক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে পড়েছিল। নীৎশের এমন ব্যাখ্যার জন্য অনেকে তাঁর লেখার অনির্দিষ্টতা, দূর্বোধ্যতা, অবোধগোম্যতা ও আবেগময়তা প্রভৃতিকে দায়ী করেছেন। তাছাড়া, উনিশ-বিশ শতকে ইউরোপে প্রচলিত আদর্শ ছিল সাম্য, মানবতা ও গণতন্ত্র। কিন্তু নীৎশের অবস্থান ছিল এসবের বিরুদ্ধে। তাই তাঁকে নিয়ে বিতর্ক ওঠাই স্বাভাবিক। তবে তিনি জাতীয়তাবাদকে সমর্থন করেননি। এমনকি জার্মান জাত্যাভিমান নিয়ে তাঁর রক্ষণশীলতা কোনো রচনায় নজরে পড়ে না। তাই, সরলভাবে তাঁকে নাৎসীবাদের সাথে জড়ানো সঙ্গত বলে মনে হয় না।